শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

১।২৯৬

৪

২৯৮৭

৮।২৯৩৭

সাহিত্য

শ্রীশ্রী বালব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

LIBRARY
No... ১১.১.২৮৭
Shri ... Ashram
BANARAS

PRESENTED

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশ-সংগ্রহের অন্যান্য গ্রন্থ

১। শ্রীবীরেন্দ্র বাণী (প্রথম খণ্ড)
২। নির্দ্দেশ (প্রথম খণ্ড)
৩। তত্ত্বসার (প্রথম খণ্ড)
৪। নীতিবাদ (প্রথম খণ্ড)
৫। চর্চ্চা (প্রথম খণ্ড)
৬। চক্রতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)
৭। শূন্য ? (প্রথম খণ্ড)
৮। কালচার (প্রথম খণ্ড)
৯। কামকাঞ্চন (প্রথম খণ্ড)
১০। পবিত্রতা (প্রথম খণ্ড)
১১। প্রণয় ?
১২। একত্ব
১৩। স্বাস্থ্যতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)
১৪। অভিব্যক্তি
১৫। ILLUSION OR REALITY ?

শ্রীউমাশঙ্কর শর্মাকর

PRESENTED

LIBRARY
No. ১১৮২৬৯
Shri Shri ... Sangha Ashram
BANARAS

সাহিত্য

(প্রথম খণ্ড)

PRESENTED
শ্রীশ্রী বালব্রহ্মচারীর
বাণী-সংগ্রহ
LIBRARY
No.....
Shri ... Ashram
BANARAS

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তিদাস মজুমদার
শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

সংগ্রহতন্ত্র পাব্‌লিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্রবসু এভেনিউ কলিকাতা — ৪

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১

নববর্ষ, ১৩৬১

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :—
শ্রীযোগেশ চন্দ্র বিশ্বাস
সংগ্রহতত্ত্ব পাব্‌লিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

বাঁধাই :—
ষ্টার কোম্পানী
৯৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :—
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এলেম প্রেস
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মূল্য—এক টাকা মাত্র

PRESENTED

LIBRARY
No.....
Shri ... Ashram
BANARAS

পরমারাধ্য ভগবান্

বালব্রহ্মচারী

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে

'সাহিত্য'

অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No.....১২১২৮৭
Sri Shri ... Ashram
BANARAS
PRESENTED

সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রন্থরাজি প্রকাশে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যারা সানন্দে সর্ব্ব কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, সেই পরম স্নেহভাজন—

শ্রীজগদীশ দাশ

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

শ্রীদেবপ্রসন্ন সেন শর্ম্মা

ও

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ

—নীরব কর্ম্মীবৃন্দের কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

PRESENTED
LIBRARY
No..... ১১১২৮৭
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

আমাদের কথা

একদিন ঠাকুরকে আমরা বলেছিলাম, 'ঠাকুর, তোমার নিজের হাতে সহজ করে যদি তত্ত্বগুলো লেখ, তবে জনসাধারণের বুঝতে খুব সুবিধে হয়।' ঠাকুর বললেন, 'এক বার তো লিখেছিলাম, সেটা তো অন্যে আত্মসাৎ করেছে ; তা ছাড়া যখন যে ভাবে যা বলছি তাতো তোমরা লিখেই নিচ্ছ, আর mine-আকারে যেটা দিচ্ছি সেটা খনন করলেই সব মিলবে—বোধ্য সবই ; উপদেশমূলক বাণী—সেখানে সমস্ত রকম ভাষার সাহায্য নিয়েই এগুলো বলা হচ্ছে বা এ উপদেশগুলো দেওয়া হচ্ছে, বুঝার কোন অসুবিধা নেই একটু মন দিয়ে যদি কেউ পড়ে। সাধারণতঃ যে রকম গল্পগুচ্ছ বা গল্পসমষ্টি আছে, তত্ত্ব সে রকম হঠাৎ বললে মুখরোচক হবে না, এ জিনিষই হচ্ছে চর্ম্মাবৃত যে দেহ তাতে যে সৌন্দর্য্য বা আকর্ষণ, যে ভালবাসা ও প্রেম ঐ সৌন্দর্য্যের উপর তা যেমন প্রতিষ্ঠিত, এর একটু ভেতরে গেলেই, ভেতরে চিন্তা করলেই এগুলো আর থাকে না, তখন সেগুলো অবজ্ঞার চক্ষেই পড়ে যায়। বিষয়ানুরক্ত যে কথাটা এর অনুতে গেলেই আর অনুরক্তি থাকে না, বিরক্তিতে এসে দাঁড়ায়—এই হল এখানে প্রভেদ, আমার তত্ত্ব হল ঐ বাইরের চামড়ার এক পর্দ্দা নীচে।

এখন যেই বিষয়ানুরক্ত বা বিষয়াসক্ত সেই বিষয়বস্তু নিয়েই আমার তত্ত্ব, সেই তত্ত্বতে যে অনুরক্ত হবে, সে-ই বিষয়বস্তুর সন্ধান পাবে। সাধারণতঃ যে সন্ধানের দিকে যতটা দেখছি বিষয়েতে আছে ঠিকই বিষয়াবরণে আছে। এ আবরণের পরে আর যেতে সহজে কেউ চায় না; এখন ঐ আবরণের যে বিবরণ চলতির দিক্ দিয়ে সেটা খুব রুচিকর, তাই ঐ জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থ ইত্যাদি—ঐ সীমার মধ্যেই থেকে নড়াচড়া; তবে এইটুকুনু ঠিকই যে যতটুকুনু বিষয়-বস্তু জানিয়ে গেছেন ঐ বিষয়টুকুনুতে অনুরক্ত ঠিকই আছে।

জানিয়ে দিলে যে বিষয়ানুরক্ত হয় সেটা ত বিরল নয়; সুতরাং এক দিক্ দিয়ে বিষয়বস্তুতে ঠিকই আছে, সাধনার অতি সাধনায় যখন এই বিষয়কে সহজ করে বোধগম্য করেছে, এর পরবর্ত্তী বিষয়বস্তুসমূহকে বোধগম্য করে দেওয়ার জন্য আর এক গ্রন্থ করছি। তত্ত্ব সংযুক্ত বলেই তত্ত্ব বিষয় আছে বলে তত্ত্ব গ্রন্থ নাম নিয়েছে—অবস্থা একই, এখনও যে অবস্থা সহজ হলে সেটা আবার এই অবস্থায় পরিণত হবে। সমস্ত তত্ত্বকে এভাবে সহজ করে দেওয়াই আমার ইচ্ছা। বস্তুত্বে যেন এই মন সহজ হয়ে যায়। আজ যে সহজে এই বহিরাবরণে যে মন আকৃষ্ট তাতে যে তত্ত্ববিন্যাস, পরবর্ত্তী তত্ত্বের বিন্যাসেও যেন এই থাকে। এইভাবে এইভাবে যতদূর পর্য্যন্ত এই বস্তু ও তত্ত্ব আছে, মনও যেন সেভাবে চলতে থাকে, আর সব সময়ই যেন এই সহজবোধই থেকে যায়।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
PRESENTED
১১।১২৮

দেখ, এই চমৎকৃত কিংবা আনন্দিত কিংবা দুঃখিত—এই অবস্থা-গুলো বহিরাবরণ বা বহির্জগৎ বা পরিদৃশ্যমান জগৎ ; পরিদৃশ্যমান জগতের বহির্জগতে যে তত্ত্ব পরিদৃশ্যমানের উপরই মনোনিবেশ করে বা গ্রন্থরাজি হতে বিশ্লেষণযুক্ত তত্ত্ব নিয়ে যে মনে নানা প্রকার দুঃখ দৈন্য আনন্দভাব বৈরাগ্যভাব যত মনের ভেতর হতে থাকে, সেগুলো ঠিক বহির্জগতেরই যেন আরেকটি রূপ এই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়েতেই তা হয়ে থাকে। ঐ রূপেরই প্রতিবিম্ব বিম্বিত হচ্ছে এই ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে। যেমন বহির্জগৎ স্থূল এও তেমনি স্থূল। বহিরাবরণ স্থূল ও বহিরাবরণ দেহ স্থূল—দুইয়েরই সমভাবে যে ফুল ফুটছে সেটা বহির্মুখী হয়েই ফুটছে। আর এই বহিরাবরণ দেহ ও বহিরাবরণ—দুই স্থূলেরই সমভাবে যে ফুল ফুটছে সেটা বহির্মুখী হয়েই, তার সুগন্ধিও বহিরাগত অদৃশ্য থেকেও অদৃশ্য বস্তু ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই উপলব্ধ অনুভূত, এই রকম অদৃষ্ট ও অদৃশ্য বহু বহু বস্তু এই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই হয় অনুভূত, বহির্গত ইন্দ্রিয় অদৃষ্ট ইন্দ্রিয় সমষ্টিরই সংযুক্ত, তা অদৃশ্য হয়েও দৃশ্য, অনুভূত, এই বহির্গত সমস্ত নিয়েই অন্তর্নিহিত অদৃষ্ট বা অদৃশ্য যা যা বিষয়বস্তু আছে সেই আছে-বস্তুর সম্মুখীন হচ্ছি, এই বহির্গত বিষয়বস্তু দিয়ে যেখানেই গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি সেখানেও এই বহির্গতে যে ভাবে আছি, সেইভাবে সেখানেও গিয়ে থাকব আর বিষয়বস্তুর তত্ত্বসম্পর্কে জ্ঞাত হব। সেই অজ্ঞাত বস্তুর সম্মুখীন হচ্ছি—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—জ্ঞাত বস্তুতেই সেই অজ্ঞাত বস্তুর সাড়া পাচ্ছি।

এখন সেই অদৃষ্ট বা অদৃশ্য তত্ত্ব আমরা বহির্গত বিষয়বস্তু দিয়েই তা জ্ঞাত ; অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট বা অদৃশ্য—এটা শুধু ভাষাতেই বা নামেই অভিহিত, বস্তুর বস্তুত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে বস্তুই যে সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব আমরা এই বহির্গত বস্তু নিয়েই বস্তুত্বের সম্পর্কে জানতে যাচ্ছি ও জানাচ্ছি, প্রকারান্তরে বস্তু সবই জানা। তোমরা দৈনন্দিন যে উপদেশ-বাণীগুলো নিচ্ছ প্রতিটির খণ্ড খণ্ড জেনে শেষ অবস্থাটুকুনু না জানা পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মন্তব্য সেই পর্য্যন্তই তোমাদের থাকার চিন্তা। প্রত্যেকের সব দিনের উপদেশ ক্লাশে যোগ দেওয়ার সুবিধে হয়ে উঠে না। তাই এক-এক দিনের মন্তব্যে তখনকার জন্য এই বিচার করে বসবে না যে ইহাই শেষ ; পরবর্ত্তী এই বস্তুর তত্ত্ব খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে একদিন দেখব বস্তুও নেই, তত্ত্বও নেই। যখন দেখব বস্তুও নেই তত্ত্বও নেই, কিছুই নেই যে বলছে সেও নেই, কি করে যে বলছে এও নেই ; ক্রমশঃ ক্রমশঃ বস্তুর ভেতর দিয়ে যে অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত হবে তাই তখন জানতে পারবে। তোমরা লেখনীতে যেগুলো আবদ্ধ করছ সেগুলো তত্ত্বান্বেষণের দিকে চলতে থাকবে, ক্লাশের সমস্ত উপদেশ একত্র করলে এর মূল অর্থ বুঝতে পারবে, আর সমস্ত ক্লাশের উপদেশাবলী একত্র করলে এর মূল অর্থ বুঝতে পারবে। কারণ, তোমরা যখন প্রতিটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর তখন এখানকার অবস্থার সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগ করেই বিষয়বস্তুর তত্ত্ব বলতে হয়। এই

শ্রীউমাশঙ্কর পরিষদ

খুচরো খুচরো প্রশ্ন মীমাংসার দ্বারা মীমাংসিত বস্তুর সমাধান হয় না। ব্যবহারিক ভাষা দিয়ে সমস্ত ভাব প্রকাশ হয়, ভাব ভাষাতীত; তবে এই ভাষা দিয়েই সেই 'অতীত'কে ভাষায় এনে তার আভাস উপলব্ধিত করিয়ে দেওয়া যায়। ব্যবহারিক ভাষার উপরেই সবকিছু মন্তব্য হয় না, মন্তব্য করা যায় না। ব্যবহারিক ভাষার উপর মন্তব্য করার আগে সমস্ত বিষয় ও ভাব তোমরা জেনে নেবে।

কতগুলো তত্ত্ব আছে কতগুলো সংস্কারযুক্ত করা হয়। সংস্কারের ভেতর দিয়েই সংস্কার কয়েকটি নাড়াচাড়া করে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে সংস্কারমুক্ত করা, যা বলা হল তাতে বুঝা গেল সংস্কারযুক্ত, কিন্তু তাতে এই বুঝা গেল না যে আমার তত্ত্ব সংস্কারযুক্ত। আমি তোমাদের বললাম, 'এই বস্তুর ধ্যান কর'; 'ধ্যান কর' বললেই এই বুঝা গেল না যে একটা মূর্ত্তির উপাসনা বা একটা সংস্কারের উপাসনার দ্বারা ধ্যানে রাখলেন—এই ধ্যানটা সাময়িক কোন প্রলেপের জন্য দেওয়া হল। পরবর্ত্তী অবস্থা না জেনে হঠাৎ মন্তব্য করবে না; কারণ, এইটুকুনু ঠিকই—একটা পোষা হাতী দিয়ে অজস্র জংলী হাতী নিয়ে আসে; সেই পোষা হাতী এমনি ভাবে খেলে খেলে ওদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে ওর আকর্ষণেই সবাইকে নিয়ে আসে। আমার কথা হল, যে ব্যক্তি তত্ত্বে বা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তার কার্য্যকলাপগুলোর উপর উপর বিচার করলেই চলবে না, শেষ না দেখা পর্য্যন্ত। কারণ, জ্ঞানগহ্বরে

পৌঁছে দেওয়া যদি আমার কাজ হয়ে থাকে, আমি যদি পোষা হয়ে থাকি তবে আমাব কর্ত্তব্য হবে তোমাদের নানারকম খেলার ভেতর দিয়ে ঐ গহ্বরে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং ঐখানে পৌঁছে না দেওয়া পর্য্যন্ত, কুম্ভকারের মূর্ত্তি তৈরীর পূর্ব্বাবস্থা, দেখতে সেটা মোটেই রুচিকর নয়। রুচিপূর্ণ তখনই হবে যখন মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ তৈরী হবে, তাই কার্য্যকলাপের শেষ পর্য্যন্ত জেনে নেবে, কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য জানবে, তারপর তৈরী হতে থাকবে, তাই তোমাদের প্রথম উদ্দেশ্য জানাব, তারপর মূর্ত্তি তৈরীর কাঠামো ইত্যাদি—এগুলো সব সময় মনে রাখবে। অনেক সময় অনেকে নানাপ্রকার ভুল করে বসে না বুঝে। একজনের আঙ্গুল দেখলেই কিন্তু তাকে চেনা গেল না, তারপর হাতটি বাড়িয়ে দিল চেনা গেল না, সমস্ত অঙ্গটুকুনু না দেখা পর্য্যন্ত ধারণাতেই থেকে যাচ্ছে—এই তো সেই, মনে হয় এই হবে। 'এই মনে হয় মনে হয়' চলতে চলতে নানারকম সমস্যার মাঝে থেকে যাবে; সমস্যা তখনই সমাধান হবে সম্পূর্ণ অঙ্গ যখন দৃষ্টি গোচরে আসবে। আমারও সেই কথা —সম্পূর্ণ অঙ্গ পূর্ণভাবে তখন এই জ্ঞানগহ্বরে আসবে, তখনই সেই সম্পর্কে জানতে পারবে যে আমরা কোথায়, বা আছি কি নেই সেই সমস্যার সমাধান হবে। তখন শূন্যই হক মহাশূন্যই হক, কিছুই নেই হক, একটা কিছু বের হয়ে যাবে, উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য তখনই জানতে পারবে, তা হলেই হবে। এই অযথা বিবাদ—কে কোন মতে আছে, কে কোন পথে আছে—

কোন চীৎকারই আর থাকবে না। তাই অবস্থানুযায়ী যখন যা দেওয়া কর্ত্তব্য, অবস্থা বুঝে বুঝে দিয়ে যাবো, মূর্ত্তি তৈরী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনো কিছু না বুঝলে জিজ্ঞেস করবে যে এখানকার কি অর্থ, তা হলেই তখনকার মীমাংসা হবে। তোমাদের যে অনুরোধ তোমরা জানিয়েছ, সময়ান্তরে এই বিষয়ে যতটা পারি চেষ্টা করব।'

ঠাকুর সহজভাবে সহজ ভাষায় বারবার করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। "তিনি আমাদের বলতেন, 'দেখ, ভাষার অভাবে সেই ভাবকে বুঝানো একটু অসুবিধে, তাই যখন যে বিষয়বস্তু আলাপ করবো তা না বুঝলে আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করবে, তাতে আমি মোটেই বিরক্তি বোধ করবো না।' তাই যখনই যে বিষয়বস্তু না বুঝতাম, তখনই তা বুঝে নেওয়ার জন্য সমাধানের জন্য বার বার জিজ্ঞেস করে নিতাম। সাধারণতঃ উপদেশ দেওয়ার আগে তিনি বলতেন, 'তোমরা অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বান্ লোক উপস্থিত, তোমাদের ভাষার গুণে বুঝবে ও বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। কারণ, গ্রন্থের পরিচয়ে আসার সুযোগ আমার হয়নি, আমার সম্পর্ক বাচ্চা বয়স হতে ভাবের সঙ্গে হওয়াতে, ভাবই হয়ে গেছে আমার এক জাতীয় ভাষা, তাই পুস্তকাদির ভাষা ভাবে আনতে সময় পাইনি। ভাবছিলাম, গ্রন্থের ভাষার সাহায্যে ভাবকে প্রকাশ করবো, কিন্তু এমনি লোকের ভিড়, 'গুরু'ই সাজবো, না পুস্তকই পড়বো। তাই এই মহান্‌গিরি রাখতে গিয়ে আমার আর ভাষার রাজত্বে যাওয়ার সময় হয়ে উঠেনি, যতটুকু ভাবরাজত্বে বিরাজ করেছি, তার

সম্পর্কে যতটুকু অবগতে এসেছি, আমার জানাই যে শেষ জানা, সেটুকু আমার পক্ষে বলা সমীচীন হয় না। শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি, আমার বুঝে যতটুকু বুঝেছি, ততটুকুই তোমাদের জানিয়ে যাচ্ছি। তাই একটি সহজ কথাকেও একটি সহজ ভাবকেও বুঝাতে গিয়ে আমার যত পরিশ্রম করতে হয়, একটা ভাষা জানা থাকলে যে জিনিষটাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যেতো, আমি সে জিনিষের সঙ্গে সম্পর্কিত নই বলে হাতড়াতে হাড়েহাড়ে এতদূর এগিয়ে যাই সেই বিষয়বস্তুকে অবগত করিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তোমাদের নিকট বিরক্তিস্বরূপ হলেও আমি নিজে বিরক্তবোধ করি না। তাই অনেক সময় একটা বিষয়বস্তুকে বার বার ফেনিয়ে ফেনিয়ে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুকে বুঝিয়ে যাচ্ছি একই জাতীয় ভাষার মধ্যে দিয়ে। এখানে যদি শব্দসম্পদ্ থাকতো, তবে সম্পদের পরিচয় ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো। মূক হওয়ার চেয়ে 'উন্মুকতা' তো একটু আছে। নিজের এই চিদানন্দের একটু আভাস দিতে যে সমর্থ আছি, তাতেই নিজে একটু আনন্দ অনুভব করছি।' "*

নিয়মিত ক্লাশে প্রদত্ত বাণীসমূহ অনাবিল অনর্গল গতিতে বের হয়ে আসত ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে। ভাষণের দ্রুততায় তা লেখনীতে ধরে রাখা আমাদের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, তথাপি ঠাকুরের কৃপায় যা উদ্ধৃত করতে সমর্থ হয়েছি, প্রদত্ত

---

* 'শ্রীবীরেন্দ্রবাণী' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত।

শ্রীউপাসনা মন্দির

ভাষণের সমস্ত তথ্যই তাতে আছে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা ও বিশ্বাস। সঙ্কলিত গ্রন্থে ভাব, ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ বা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থেকে থাকে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমরাই।

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তিদাশ মজুমদার
শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য

PRESENTED

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

আভাস

প্রতিদিন ক্লাশে ঠাকুর কারো কিছু বলার বা জানার আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। ক্লাশে এক-এক রকম প্রশ্ন হয়ে থাকে, আবার কেউ কেউ আগ থেকেই প্রশ্ন লিখে নিয়ে আসে। ঠাকুর আস্তে আস্তে তাদের সেই প্রশ্নগুলো সমাধান করে দেন। 'নোট' তো আমরা সব সময়ই নিচ্ছি। সাহিত্যের বিষয় নিয়ে সেদিন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ঠাকুর সাহিত্যের বিষয় কিছু বললেন, "সাহিত্যপ্রতিভা যে সকলের মধ্যেই রয়েছে এবং তাই যে প্রতিভাত হয়ে নানাভাবে নানা দিক্ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর বাস্তবে যে কেহ যে কোন দিক্ দিয়ে যে-কোন কার্য্য করে সেটাই তার দক্ষতা। ন্যায়ের দিকে যেমন অন্যায়ের দিকেও তেমন, সূক্ষ্ম কার্য্য যে দক্ষতার দ্বারা, যে-কোন দিক্ দিয়ে যে কোন লাইন দ্বারা তা প্রকাশিত, সেই কার্য্যেই দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার প্রকাশ।

ন্যায় বা অন্যায় গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য সেটা হল গ্রহণের ব্যাপারে। সেই প্রসঙ্গ উঠছে না,প্রসঙ্গ উঠছে যে শক্তির বিকাশ যে দিক্ দিয়েই হউক তার সফলতাই হচ্ছে প্রতিভার প্রকাশ। এই প্রতিভা বা এই 'ক্যালিবার' বা এই শক্তি সর্ব্ব জীবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। বহুগুণের সমষ্টি নিয়ে এই গুণবিভাগে বিভক্তভাবে যে গুণের প্রকাশ, তা তো সেই সমষ্টিগত গুণেরই প্রকাশ। এই

গুণ নিয়েই জীব, এই গুণ সর্ব্বজীবেই বিদ্যমান, একজনের হচ্ছে আরেক জন ঐ জিনিষটা হতে যে চ্যুত তা বলা সমীচীন হয় না, তার কারণ তার যা আছে সে তা করছে না। তার যে ওটা নেই তা নয়, তবে পছন্দ বা অপছন্দের উপর কার্য্যকলাপগুলোর দক্ষতার প্রকাশ তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। এই পছন্দ অপছন্দগুলো নির্ভর করছে পরিবেষ্টনীর চাপের উপর, পরিবেষ্টনী হতে যে যতটুকু শিখবার সুযোগ পাবে সে ততটুকুনু সেই কার্য্যে সুস্পষ্টতার পরিচয় দিতে পারবে। এই পছন্দ অপছন্দ হচ্ছে—love at the first sight, হঠাৎ একটা কিছু যখন ভাল লেগে গেল, তাকে বাড়ীতে শিক্ষক রেখে আর একটি ভাল লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ যে প্রথম যেটা ভাল লাগল, সেটা এক মুহূর্ত্তেই হল, আর ভাল লাগিয়ে দেওয়ার জন্য দশ ঘণ্টা চেষ্টা হচ্ছে, ঐ প্রথম দর্শনে বা প্রথম চিন্তাধারাতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা তার ভেতরকার 'গ্ল্যাণ্ড' ঠিক এমন মাত্রামাফিক কার্য্য করে গেল যে সঙ্গে সঙ্গে তার সে জিনিষটা প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। ঐ প্রস্ফুটিত হয়ে গেল বলেই ঐ বিষয়ে সে interested হয়ে গেল; আর দশ ঘণ্টা পেছনে যে রকম চাপ পড়তে আরম্ভ করল, আর যে সুযোগ পেতে আরম্ভ করল, তাতে সেই 'গ্ল্যাণ্ড' সেই অংশ আর প্রস্ফুটিত হল না।

হংসডিম্ব মুর্গীর 'তা'তে প্রস্ফুটিত হয়ে বাচ্চা বের হয়ে থাকে। অধিক তপ্তে রাখলে তাতে আর বাচ্চা বের হবে না, সিদ্ধ হয়ে যাবে। ঐ মাত্রামাফিক তাপে ঐ ডিম্বকোষ অর্থাৎ 'গ্ল্যাণ্ড' ঐ 'তা'তেই ফোটে, এখানে অধিক তাপে যা হবে না, মাত্রামাফিক

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য
১১।২।

তাপ দিলে তা হয়ে যাবে। তাই এখানে অনেকেরই প্রশ্ন থেকে যায়—এত চেষ্টা, এত প্রচেষ্টা, এত যত্ন, এত খাওয়া, এত সুযোগ সুবিধা, এত অর্থব্যয়, কিন্তু কৈ কিছুতেই তো কিছু হচ্ছে না, আর কুঁড়ে ঘরে থেকে অর্দ্ধপেট খেয়ে সে তার চেয়ে অজস্র গুণ সাফল্য লাভ করেছে। এখানে বেশীর ভাগ বাস্তবে অদৃষ্ট বাদের উপরই নির্ভর করে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে অদৃষ্টবাদের কোন প্রশ্নই আসছে না, এই ভাল মন্দ বা পছন্দ অপছন্দগুলো অবস্থার পরিবেষ্টনী অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়ে থাকে; পুনরায় তার চেয়ে আরও সুন্দর জিনিষ তার ভেতর না আসা পর্য্যন্ত ঐ অবস্থাটি কিছুতেই আর যায় না, সেটা এখানকার পছন্দেরও হতে পারে অপছন্দেরও হতে পারে।

এক চোরকে এক সাধু বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। সে তার গুরুর নিকট নিজের কথা বলল যে, মধ্যরাত্র হলেই সে চুরি না করে পারে না, তবে অমাবস্যা আসলে সে আর কেনে বাধাই মানবে না। গুরু তাকে বললেন, 'যা হউক, তুমি আর রাত্রে বের হতে পারবে না, তোমাকে পায়ে কড়া বেঁধে তোমার স্ত্রী রেখে দেবে আবার প্রাতঃকালে খুলে দেবে। ঐভাবে ঐ রাত্রের ভাবটা তার মন হতে সরে গিয়েছিল। কিন্তু এই চুরির ভাবটা কি করে এল? তার প্রথম দর্শনে সে এই চুরি করে এক জায়গায় খুব কৃতিত্ব লাভ করেছিল। সেখানে একবার সে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হতে সম্মান পেয়েছিল। সে দেখল 'এত পরিশ্রম করে লোকে যা-না করতে পারে, আমি তো অল্পেই

তা করে ফেললাম।' অনেক জায়গায় অনেক রকম দাতা উদার অনেক সুনাম অর্জ্জন করেছিল, ঐ চমৎকৃতেই সে দিনরাত আছে কি করে সুনাম অর্জ্জন করবে, আর এত সহজে এভাবে লভ্য যা অতি পরিশ্রম করে কেউ করতে পারে না, তবে যাই হউক জীবনে পরিশেষে তার অনুতাপ হওয়াতেই ঐ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হল।

গুরুর আজ্ঞা পালন করবে—এই স্থির করেই সে ঝুলনা নিয়ে তীর্থ পরিভ্রমণে বের হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করতে হয়, তাই বিশ্রামের পথে তাকে নাগাল পেল অমাবস্যার রাত্রিতে। আগের রাতগুলো যেভাবেই হউক কোন মতে কাটিয়ে দিল। কিন্তু অমাবস্যার রাত্রি তো তার পক্ষে কাটান অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু ধর্ম্মশালায় বহু যাত্রীই আছেন, তারা বেশীর-ভাগই ঝুলনাধারী, সবাই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত। কিন্তু তার মন উচাটনে মধ্যরাত্রে উছুটপিছুট্ করতে আরম্ভ করল। এদিকে আবার গুরুর আজ্ঞা—শ্বেতকণিকা এখন রক্তকণিকার সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। এখন কে জিতবে, বহুদিনের সংক্রামক ব্যাধি কিনা, তাই সংক্রামকে দাঁড়িয়ে গেছে, এদিকে গুরুর আজ্ঞা, তাই অবশেষে স্থির করল যে গুরুর আজ্ঞাই তার রাখতে হবে। সে উঠে যতগুলো ঝুলনা ছিল সবগুলো অদলবদল করে একজনের ঝুলনা আর একজনের ঝুলনার জায়গায় রেখে দিতে আরম্ভ করল। তার অভ্যাসবৃত্তির এতে কিছুটা লাঘব হওয়াতে পুনরায় সে বিশ্রাম করতে আরম্ভ করল।

LIBRARY
No.....
Shiv Shri ... Ashram
BANARAS

এদিকে সব ঝুলনাধারীর ঝুলনার অভাবে যা হয় তাই হল। তার ওটাই প্রস্ফুটিত হয়েছিল প্রথম দর্শনে, তবে ঐ ডিম্বকোষই প্রস্ফুটিত হয়েছিল; কিন্তু তাকে মানুষ করার জন্য বহু পরিশ্রম করেছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই আর কাঠ কুলালো না। তাই উদরে যদি ব্যাধি থাকে এদিকে অতি উত্তম খাদ্যেতে আর কি হবে! হজমশক্তির গোড়াতেই যে গলদ, কারণ প্রথম দর্শনে পরিবেষ্টনীর চাপ, যার জন্য উদরে ব্যাধি সেই সংক্রামকই নিয়ে এল। ঐ ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের সংস্পর্শ হতে ঐসঙ্গ ঐ পরিবেশই তার জীবনের যদি ক্ষতিকারক হয়ে থাকে, তবে সেটা ওখান হতেই হয়েছে। ঐ ক্ষতিকারকের মূলে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমনভাবে পতিত হয়েছিল যার জন্য তার এত বড় সফলতা, ব্যাধি ঠিকই হয়েছিল, এই ব্যাধি যদি উপাধি হত তা হলে কিনা হত বাস্তবে; ব্যাধিটি সাংঘাতিক, বাস্তবে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যদি ওদিকে পতিত হত, তাও সাংঘাতিক হত।

অনিষ্টের দিকে যারা যায় সেটাও সাংঘাতিক, অনিষ্টের বিপরীত দিকে যারা যায় সেটাও সাংঘাতিক—শক্তির বিকাশ দুই, প্রতিভার বিকাশ দুই'ই, এগুলো সবাই গ্রন্থেরই জীবনচরিত, কারণ, এক একজন এক-একটি গ্রন্থ। কেহ লেখনীর দ্বারা সেগুলো বর্ণনা করছেন, কেউ ভাবের দ্বারা সেগুলো বর্ণনা করছেন, কেউ কার্য্যকলাপের দ্বারা বর্ণনা করছেন; সেটা লেখনীতে আবদ্ধ না থাকলেও স্মৃতিতে আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে —স্মৃতিই তাদের গ্রন্থ। এই প্রাকৃতিক রাজত্বে তাদের

স্মৃতিরূপে সেগুলো থেকে যাচ্ছে। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি, তীক্ষ্ণ দক্ষতা সবই বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই কার্য্যে নেমে গিয়েছিল, রচনা ঠিকই হচ্ছে, ওরা জীবনে প্রত্যেকেই এক একজন সাহিত্যিক—প্রতি কার্য্যে, ছন্দে, গন্ধে, গীতে কোন দিক্ দিয়েই ত্রুটি নেই।

অপরাধীরা যখন অপরাধ করে তারা অনেক দিকে দিক্-দৃষ্টি রেখেও করে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণতার ও দক্ষতার চরম পরিচয় এই অপরাধের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। সমালোচনার দিক্ দিয়ে পরিশেষে হয় কারাগারে না হয় অপরাধের দিক্ দিয়ে, যেদিক্ দিয়েই পতিত হউক সেটা লেখনীর দ্বারা যারা সাহিত্য ও গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন তাদের বেলায়ও এর হাত হতে অনেকেই রেহাই পাননি। সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিমাতে পড়েছেনই, এখন দিক্‌দৃষ্টির ভেতর দিয়ে বিচার করতে গেলে সাহিত্যপ্রতিভা একদিক্ দিয়ে না একদিক্ দিয়ে সকলের ভেতরই বিদ্যমান—বিকাশ বা প্রকাশ সেটা হল অবস্থার পরিচাপ।"

এখানে ঠাকুর বলতে চাচ্ছেন যে, আমাদের যে একটা ধারণা ছিল সাহিত্য যে জিনিষ, সেটা আলাদা একটা প্রতিভা, সেটা বহু গ্রন্থপাঠ, সেটায় জন্মগত গুণও প্রতিভা থাকে। কিন্তু এখন দেখছি যে এই 'ক্যালিবার' যখন সবার ভেতর রয়েছে, তবে চেষ্টা করলে সবাই সবকিছু করতে পারে—ইহাই এর মর্ম্মার্থ। চেষ্টা যখনই করি, প্রথম দর্শনে কি এল সেটাই চিন্তার বিষয়, চিন্তা যখনই করি একটা লেগে আছেই।

ঠাকুর বল্লেন, "দেখ, ভাল লাগছে না, ইচ্ছে করছে না, মনকে

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
১১।২।৮৭

কিছুর মধ্যেই আঁকড়ে রাখতে পারা যাচ্ছে না—ওগুলো এক-জাতীয় ব্যাধিই ; ঐ ব্যাধিগ্রস্তেরই সংস্পর্শে এসেছে।" তারপর ঠাকুর একটু রগড়পূর্ণভাবে বল্লেন, "দেখ, তোমরা স্বেচ্ছাসেবক, তোমরা ব্যাধির সেবা বেশী কর কিনা, তাই যখন সেবায় নিবিষ্ট হয়ে পড়, তখন প্রতিরোধক নিয়ে যা করা দরকার তা ভাববার সময়ও থাকে না। কারণ, এত বেশী তোমরা নিবিষ্ট, পরোপকারের দিক্ দিয়ে যে তাতে সংক্রামক ব্যাধি অল্পেতেই আক্রমণ করে ফেলে, তাই উপকার কর ক্ষতি নেই, তার প্রতিষেধকের বন্দোবস্ত করে নেওয়াও সমীচীন ; তবেই মনে হয় সবকিছু হতেই রেহাই পাওয়া যেতে পারে। তাই যখন চিন্তা করি ব্যাধি-গ্রস্তই বেশী দেখি, তাই তাদের সাহিত্যপ্রতিভার দ্বারা ব্যাধির গ্রন্থই রচনা করছে। তবে একদিকে এখন খুসী আছে, কারণ তারা 'রচনাকারী' আখ্যা পেয়েছে।" এখানে ঠাকুর একটু রগড় করেই কথা বলছিলেন।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

সাহিত্য

এক

সাহিত্যসম্পর্কে যে বিষয় জানতে চেয়েছ সে বিষয়ে কয়েকটি কথা মাত্র বলছি। সাহিত্যের প্রকৃত রূপই হচ্ছে সঙ্গ, সংসর্গ, আর প্রকৃত সাহিত্যই হচ্ছে এই প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক গ্রন্থকে বা প্রকৃতিকে যে ভাল করে পাঠ করেছে সেই সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যের অধিকারী হয়েছে। এই সাহিত্যসেবায় যে মনোনিবেশ করেছে সে-ই এই শাস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। সাহিত্য বলতে গেলেই নানারূপ গ্রন্থ ইত্যাদি মনে করা হয়। কিন্তু এ গ্রন্থগুলো কোথা হতে আসছে? এই গ্রন্থ চর্চ্চা হচ্ছে—প্রাকৃতিক যে জগৎ আমাদের সম্মুখীন, যে জগৎ আমরা চক্ষের সামনে দেখছি বা উপলব্ধি করছি—এই সকল তত্ত্ব যে গূঢ় ভাবে জানতে পেরেছে সে-ই এই শাস্ত্রের বিষদ ব্যাখ্যা লিখে প্রকৃত সাহিত্যিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছে।

সাহিত্যহিসেবে সবকিছুই এখানে আসে; কারণ, এই প্রকৃতির সাথে যে গভীরভাবে সঙ্গ করতে পেরেছে এবং এর ভেতর দিয়ে সহজভাবে প্রাকৃতিক গুণের বিকাশ করেছে—কথাগুলো ব্যবহারিক হিসাবেই তোমাদের জানাচ্ছি, কারণ তত্ত্বে গেলেই

এর অন্য ব্যাখ্যায় যেতে হয়। তবে ব্যবহারিক দিক্ দিয়ে যা যা হচ্ছে তাই আসছে—এই মেধাকেও সাহিত্যানুরাগ বলা যেতে পারে, এই অনুরাগ সাহিত্যসেবা হতেই হয়ে থাকে। এই সেবার দ্বারাই সাহিত্যসেবী নামে পরিচিত হয়, আর এরাই এখানে এক একজনে এক-একটি অধ্যাপক নামে অভিহিত হন। এই অধ্যাপকই সাহিত্যাধ্যাপক, শাস্ত্র-বিদ্‌রা যে শাস্ত্র লিখেছেন এও সাহিত্যশাস্ত্রই, কবিরা যে কবিতার ভেতর দিয়ে যেই প্রাকৃতিক গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন ইহাও সাহিত্য ছাড়া নয়; কারণ, এখানেও সাহিত্যানুরাগেরই পরিচয় —চর্চ্চা এখানেও আছে, সঙ্গ এখানেও আছে।

যন্ত্রের ভেতর দিয়ে, সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে, ক্রীড়ার ভেতর দিয়ে, নৃত্যের ভেতর দিয়ে, কৌতুকের ভেতর দিয়ে, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে, সাধনার দিক্ দিয়ে, প্রেম ভালবাসার দিক্ দিয়ে, যে-কোন গুণেরই যে পরিচয়ের বিকাশ হয় তা এই সঙ্গ ছাড়া নয়। এই সঙ্গই হচ্ছে সঙ্গত, এখানেই যোগ, এই যোগ আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত—এটা আমাদের জন্মগত, প্রতিটি জীবের ভেতরেই এটা প্রতিষ্ঠিত এবং আমরা এই নিয়েই জাত। ইহা স্বভাবজাত ও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেরই বশীভূত—ইহাই নৈসর্গিক, এটাকেই নৈসর্গিক বলা হয়। এখন দেখা গেল যে প্রকৃত প্রস্তাবে সবাই সাহিত্যিক। কারণ, যে বক্ বক্ ক'রে বক্‌ছে সেও তার অনুরাগেরই পরিচয় দিচ্ছে। কি ক'রে কোন ভাবে গালি দিলে সে চটবে, সেই সেই ভাবে

সজ্জিত ক'রে তার গালিগুলো প্রয়োগ করে যাচ্ছে, এইরকম উত্তেজনার সেই অবস্থাতেও তা তার স্বভাবজাত। মন ঐ সঙ্গতে সঙ্গত করে যে নিষ্কাশন করছে এবং ঐ অবস্থায় যা যা বলছে তা তার জন্যই ঠিক এবং তা তখনকার জন্য ঠিক; কারণ সেখানেও মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন আছে।

কি বললে কি হবে না হবে, সেদিক্ দিয়ে তার বিবেচনা রয়েছে। সে যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে, তার যদি মারও খেতে হয়, তার জন্য প্রস্তুত থেকেই সে তার উদ্দেশ্য হতে চ্যুত হচ্ছে না, আবার যাতে অপদস্থ বা মার খেতে না হয় তার জন্যও প্রস্তুত হয়ে সে আর একভাবে ব'লে সে তার কার্য্য সিদ্ধি করে নিচ্ছে। এই যে বিনিময়ের অবস্থা এটা সঙ্গতের অবস্থা, কারণ সে যখন বলছে, তার প্রত্যুত্তরে সে বলিয়েও নিচ্ছে—এই বলাবলির ভেতরই বোল চলতে থাকে। এই বোলই হল সাহিত্য, এই বোলকেই যে বলীয়ান করতে পারে, যার যত বেশী বলের বিকাশ বা শক্তির বিকাশ করতে যে যত বেশী সমর্থ, জিনিষের যে যত বেশী সূক্ষ্ম বের করতে পারে বা নিঙড়াতে পারে তার সাহিত্য তত বেশী সুন্দর বা মধুর হয় এবং তারাই প্রকৃত সাহিত্যসেবার অধিকারী বা তারাই সাহিত্যিক; তারাই হয় পরে অধ্যাপক এবং শিক্ষা-দাতা।

প্রকারান্তরে, এই অধ্যাপক বা শিক্ষাদাতার যে অবস্থা, এটা আবার প্রতিটি জীবের ভেতরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কারণ, জীব

যতই বেশী অনুরাগের পরিচয় দিক্ সাহিত্যশাস্ত্রের দিক্ দিয়ে, এই গুণ তাতে ছিল বলেই তো বের হচ্ছে নতুবা সে এগুলোকে কোথা হতে বের করত। তোমার ভেতরে ইন্দ্রিয় আছে বলেই তো তার দ্বারা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করতে পারছ ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলো আগেই বর্ণনার সহিত বর্ণিত হয়ে আছে, পরবর্ত্তী যে রঙবেরঙের বর্ণনা হচ্ছে সেটা নূতন করে লাগলেও নূতন নয়, আবার নূতন বলে যে চমৎকার লাগছে তাও আবার একজাতীয় নূতন অবস্থা পরবর্ত্তী অবস্থাকে বিকশিত করার জন্য।

সাগরে রত্ন—রত্ন বের করা নূতন কিছু করা নয়, যা আছে তাকেই বের করা। তবে এই মহার্ণবরূপ যে রূপের ভেতর হতে বহু রত্ন খুঁজে বের করা হচ্ছে, নব রত্ন রূপে রত্ন বের করে যেই উপাধি দেওয়া হয়, উপাধি হিসাবেই থাকে, কিন্তু নূতন কিছু দেওয়া হল না, আবার কিছু দেওয়া হল, এখানেই হচ্ছে চর্চ্চা বা সঙ্গত, এখানেই চর্চ্চা ও সঙ্গতের দরকার। সঙ্গত খুব গভীরভাবে থাকলে ঐ যন্ত্রের ভেতর যে কয়টি পর্দ্দা রয়েছে, যে পর্দ্দাতে সব সুরই ন্যস্ত থাকে এবং সুরও যেখানে লীন হয়ে থাকে, আবার যন্ত্র টিপলে সেই সুর যেমন বইতে থাকে, সেই ভাবধারার প্রতি যে আসক্তি তাই হল সাহিত্যানুরাগ।

এই রাগরাগিনীতে যে টান দিয়েছে, এই টানেই অনুরাগীতে পরিণত হয়েছে। আজ ব্যবহারিক দিক্ দিয়ে যে সাহিত্যের

চর্চ্চা এখানে হচ্ছে, নানা বিকৃতের মাঝেও এটা চলছে। কারণ, সাহিত্যকে ব্যবসায় পরিণত করলে সেটা সাহিত্য-ব্যবসাই বলা হয়, কারণ এর দ্বারা সে করছে জীবিকানির্ব্বাহ এবং জীবিকা-নির্ব্বাহ বলতে শুধু খাওয়াপরাই নয়—যশ, মান, অহঙ্কার, প্রতিষ্ঠা—এগুলো সাথেই জড়িত। এর ভেতর যখন মন আকৃষ্ট হয় তখন সাহিত্যচর্চ্চাতে একটু বৈষম্য ঘটেই; তবে সে জাতীয় সাহিত্যচর্চ্চাতে এ জাতায় খোরাক থাকলে এও করতো কিনা সন্দেহ; সুতরাং প্রেরণা কয়েক রকমেরই আছে—কেউ করছে যশে মানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, আবার কেউ করছে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জগতের সম্মুখীন করতে, আবার কেউ চাচ্ছে নানা অলঙ্কারের ভেতর দিয়ে সাহিত্যকে ফুটাতে, আবার কেউ চাচ্ছে সত্যে যাতে অনুরক্ত হয় সেই অনুরাগ-পূর্ণ সাহিত্য দান করতে, আবার কেউ চাচ্ছে তুলনামূলক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়েও সাহিত্যকে প্রস্ফুটিত করতে। এখন এই যে প্রস্ফুটিত অবস্থা এক-এক জায়গায় এক-এক গুণ; আবার চিন্তাধারার উপর সঙ্গতেই প্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টি-ভঙ্গিমা এক একজনের এক-এক জায়গায় রয়েছে, আবার সাহিত্য সংস্কারের উপরও এখানে রয়েছে। এতগুলোর ভেতর দিয়ে এই শাস্ত্র এসে উপস্থিত হচ্ছে যে, পাঠকরা যারা পাঠ করছেন তারা পাঠই করছেন, তারা ঐ সকল পাঠ করে নূতন কিছু লিখবার চেষ্টা করছেন না। সব লেখার সব লেখনী তখনই পোক্ত হবে বা ঠিক্ হবে যখন তোমার চিন্তাধারার

সাথে এই সৃষ্টির নিয়মাদির সহিত তুমি একই যুক্ততায় থেকে তত্ত্বের বিকাশ করবে, সুতরাং তখনই তাদের থাকতে হবে সেই চিন্তাতে চিন্তাযুক্ত। যারা বিবেক বৈরাগ্যের ভেতর দিয়ে, যে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বৈরাগ্যের প্রকাশ করছেন, এই ভাবে প্রবণতা যদিও স্বাভাবিক মতে আসে, এই ভাব-গুলো একটা হেঁয়ালির মাঝে দুলতে থাকে, তার কারণ, এই ভাব আমাদের নিজেদের সংস্কারাধীন।

এই সংস্কার আমাদের নিজেদেরই তৈরী, কারণ ভগবানের ভগবত্তাসম্পর্কে অজ্ঞানতা, কিন্তু একটা কল্পনার দ্বারা কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর এমন অবস্থা; ঐরূপ অবস্থার দ্বারাই যে ভাব বা ভাবপ্রবণতা, তার উপর নির্ভর করে করলেন গ্রন্থ রচনা। এখন ঐ গ্রন্থ তখনকার সেইভাবের ভেতর বেশ মধুরই লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা যেন ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যাওয়ার মত—শরীরে হাত বুলিয়ে যেমন বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো হয়, এটাও ঠিক সেই জাতীয় ঘুম পাড়ানোর মত।

ভাবের দ্বারা আমাদের এই শক্তিসম্পন্ন মন, তেজস্বী মনের ভেতর ছায়ার মত ঠাণ্ডা এমন একটা ভাব ফেলে দেওয়া হয় যে তেজপূর্ণ মন তখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই ভাবগুলো কেন হয়? এই ইন্দ্রিয়গুলোর স্বাভাবিক স্বভাব বিশ্রাম নেওয়া এবং বিশ্রামের চরম হল নিদ্রিত অবস্থা, তার চরম হল একেবারে অবসানের অবস্থা। যেখানেই দেহের অবসান

ঘটতে পারে, তার পূর্ব্বাভাস—একটু দোলানো ভাব, একটু নিস্তেজ ভাব, একটু শিথিল ভাব, নানারকম মাদকতার ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা তো অস্বাভাবিক নয়। ঐগুলো হতে শেষ পরিণতি হচ্ছে দেহের অবসান, সুতরাং তার আগপর্য্যন্ত হতেই থাকে অবসাদ—এই অবসাদ হওয়াটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়; এই অবসাদজাতীয় যত প্রকার বাণী আছে কথাবার্ত্তা আছে, এর ভেতরে, মানে, এই ইন্দ্রিয়াদির ভেতরে—চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদির ভেতরে যতই খেলান যায় ততই মাদকতা এসে পড়ে—মাদক-দ্রব্যেও এই নেশাই হয়। দ্রব্যগুণে যেমন নেশা হয় ভাব-গুণেও তাই হয়—ওটাও দ্রব্য ছাড়া নয়।

দ্রব্য একটা হল ব্যবহারিক দিক্ দিয়ে আর একটা হল ভাবপ্রবণতার দিক্ দিয়ে। তেঁতুল খাওয়া আর তেঁতুল খাওয়ার কথা ভাবা—লালার দিক্ দিয়ে বেশী বৈষম্য নেই। ভাবপ্রবণতা কল্পনার উপরই প্রতিষ্ঠিত কিনা সেখানে স্বর্গরচনা, সেখানেই সপ্তলোক। নানারকম কল্পনারচিত যে রূপ এখানে সেই চর্চ্চাগুলো এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যা পাঠ করলে মনে হয় যেন সেখানেই আছি এবং সেখানে থাকার জন্য ও যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও চলছে। এই যে ভাব এই ভাবের ভাবধারার যে ধারা আমাদের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সাহিত্যের বা গ্রন্থাদির ভেতর দিয়ে এই সঙ্গতে বা এই সংসর্গে যারা আছেন তারা ঐ ভাববিশিষ্টেই আছেন।

আর মাদক দ্রব্যের নেশা যেমন একবার করলে ছাড়া দুষ্কর, শত বললেও ছাড়ান যায় না, ইহাও ঠিক তেমনি সংক্রামক, যাকে এই সঙ্গের সংসর্গে একবার ধরেছে সে-ই ডুবেছে। আবার অহিফেনের নেশায় যারা মজেছে, আর মাত্রা যারা বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের আরো বিপদ—তাদের পক্ষে ছাড়া মানে মরা। এখন এই অহিফেনজাতীয় নেশায় যাদেরে বশীভূত করে ফেলেছে, তারা এই নেশার সম্পর্কে এই অহিফেনের নেশাসম্পর্কেই গ্রন্থ রচনা করল। তারা এই আসক্তিতে এমনি রয়েছে যে তাদের লেখনীগুলো ঠিক তেমনি চলছে, কারণ এতে তারা যে উপকৃত তা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাবে।

এই এখানকার ভাবগুলো ঠিক তদ্‌জাতীয়, সেই জন্যই আমাদের এখানে মহাদেবের পূজা হয়, নানা নেশার প্রতীক হিসেবেই তাঁকে রাখা হয়েছে, এমন কোন নেশা নেই যে তিনি তাতে ডুবে না রয়েছেন। এখন এই নেশার ভেতরে ডুবে তিনি সেই জাতীয় নেশায় থেকে সেই সত্য বস্তুর সন্ধান করছেন। সেই অনুকরণ করতে গিয়েই তারা গভীর তত্ত্বে না গিয়ে নেশাতত্ত্বে প্রবেশ করলেন। এখন আমাদের এখানে সাহিত্যের দিক্ দিয়ে ভাবরাজত্বের চর্চ্চাই হচ্ছে, এদিক্‌কার চর্চ্চার দিক্ দিয়েই বেশী প্রচলিত। এই প্রচলিতের দিক্ দিয়ে এক একজন ইচ্ছামত নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে সাহিত্যশাস্ত্র রচনা করেছেন ; আমার কথা হল এখানে

সাহিত্যজগৎ বলতে যে জগৎ এই জগতকে যে ভাল করে চিনেছে, জেনেছে, উপলব্ধি করেছে—এই উপলব্ধিগুলো শুধু ভাব-রাজত্বের ভেতর দিয়ে নয় বা কল্পনার ভেতর দিয়ে নয়, সেই ধারাবাহিক যে ভাবধারা তার উপর নির্ভর করে মনকে স্থাপন করতে বলা। তুমিও, আমার কথা হল যে, সেই ভাবধারা বা সাহিত্য ভাল করে পাঠ করে জেনে নেও ক্ষতি নেই, কিন্তু এই জগতকে যখন তুমি জানতে পারবে, জনগণের ভেতরও সাহিত্য তুমি সুন্দরভাবে দিয়ে যেতে পারবে; সুতরাং জগতকে এই ইন্দ্রিয়াদিতে যে বুদ্ধিবৃত্তি আছে তা দিয়েই চিনে নিতে হবে এবং এই চিনে নিতে যে যত বেশী পারবে সে-ই প্রকৃত সাহিত্যিক হবে, তারই হল প্রকৃত সঙ্গত, সেগুলোই সাহিত্য, সে-ই হল সাহিত্যানুরাগী। আর এই কল্পনার দিক্ দিয়ে যেতে যেতে রচনা করল এক বিরাট গ্রন্থ, নাম হল যেন 'মৃত্যুর পর-পারে'—সেখানে কি হবে না হবে এমন করে এক গল্প তৈরী করে ফেললেন, মনে হল যেন তিনি নিজেই দেখে এসে এক গ্রন্থ রচনা করে ফেললেন, কিন্তু সবই হল অলীক। এই অলীকের উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে গ্রন্থ বা সাহিত্য রচনা করে জনগণকে একটা ভিত্তিহীন চিন্তায় নিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া কিছু নয়, তাতে স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছু নয়।

যে স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তা আমাদের মধ্যে আছে সেই সাহিত্যই আমাদের পক্ষে সমীচীন। আমরা সেই রকম সাহিত্যই চর্চ্চা করতে চাই বা সঙ্গত করতে চাই, যে সাহিত্য

চর্চ্চা করলে আমরা স্বাধীনভাবে প্রতিটি বস্তু যেন চিন্তা করতে সমর্থ হই। সেখানে কোন 'মিথ্যাত্মক' থাকবে না, কল্পনা থাকবে না, গল্প থাকবে না; গল্পের ভেতর দিয়ে যে রসাস্বাদন বা রস-ভাব সেটা গল্পাকারেই থেকে যাচ্ছে, তার ভেতর মিথ্যা বা ছলের আশ্রয়, তাতে মিথ্যা বা ছলের আশ্রয়ই বেশী নিচ্ছে। কারণ, গল্প তৈরী করতে গেলে নানাপ্রকার সাতে-পাঁচে-তিনে মিশিয়ে একটা কিছু রচনা করছে—কি ক'রে কার পর কাকে বসাবে, কাকে নেবে এবং কোন বিষয় বললে মুখরোচক হবে, এই রুচি অরুচি জ্ঞানের উপর চলছে একজাতীয় চিন্তা। কিন্তু তবু কতকগুলো চর্চ্চা আছে যেগুলো একটা সাংসারিক চিন্তার উপর নির্ভর করে তৈরী, সেটা ঐ পরপারের চেয়ে অনেক সুন্দর এবং এই নিত্যনৈমিত্তিক সংসারের ভেতর দিয়ে যা চলছে, তার উপর নির্ভর করে যে আকর্ষণের সৃষ্টি করে সেটা ঐ সমস্ত কল্পনা বা ভাবের চেয়ে অনেক সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর হয় যদি জীবনের ইতিহাসগুলো সত্য প্রমাণ করে গল্পে এবং যখনই যে গল্প পাঠ করা হয় তখনই যদি সে বুঝতে পারে এই ঘটনা গল্পের চেয়েও সুন্দর, তখনই পাঠকদের পাঠ করার আগ্রহ বেড়ে যায়; সেজন্যই ইতিহাস-গুলো এত বিখ্যাত।

সত্যের উপরে ভিত্তি স্থাপন করে যে-কোন গল্পই লেখা হউক তাই সুন্দর হয়। সেটাতে অলঙ্কারের অভাব হয় সত্য, কিন্তু তাও অনেক ভাল। কিন্তু বিকৃত করে কোন রূপ দান

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

করা মোটেই সমীচীনের ভেতর পড়ে না বা সৌন্দর্য্যের ভেতর পড়ে না, কারণ তাতে প্রাণের স্পন্দন কম ; মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা যেমন তুলির টান ছাড়া কিছু নয়, এই গ্রন্থের ভেতর দিয়ে যে আকর্ষণের সৃষ্টি করা হয় সেটা গল্পরূপ তুলির টান ছাড়া নয়, সেখানে মিথ্যাত্মক কিছুটা থেকে যাচ্ছে। এই মিথ্যাত্মকের পরিণতি কি হয়—পরবর্ত্তী কোন ঘটনার সম্মুখীন হলে সে সত্য মিথ্যা বলে একজনকে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে চেষ্টা করে এবং ঘরে সেখানে অশান্তির সৃষ্টি হয়, এই অশান্তিই হচ্ছে—প্রতি মুহূর্ত্তে গল্পাকারে মিথ্যাকে সত্য বলে বুঝানো। যা যে না, তা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে ; কারণ, সত্য বলতে ভীত হচ্ছে বলে, তাতে আমাদের মনের যে তেজ, আমাদের যেই ধীশক্তি, আমাদের যে প্রতিভা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে, আজ সত্যের সম্মুখীন হতে পারছে না, কারণ তারা নিজেদের দোষে নিজেরাই দোষদুষ্ট, তাই সত্য বলতে আতঙ্ক উপস্থিত হচ্ছে। এই আতঙ্ক কেন হচ্ছে ? মিথ্যা ও অপরাধের দ্বারা এত বেশী আবৃত ও আচ্ছাদিত যে সত্য কিছুতেই বলতে পারছে না। আর যেই সত্য বলে যে সাহিত্য প্রকাশ করছেন, যে অনুরাগের পরিচয় দিচ্ছেন, তার ভাব বা সত্যকে বজায় রাখার জন্য তিনি একটি ভাব অবলম্বন করে চলছেন। সেই ভাবটি কি প্রকার ? সাহিত্যের ভাবভঙ্গি অলঙ্কারে মিশ্রিত করে যে যেমন ভাবটি প্রকাশ করছেন, ঠিক তেমনি তিনিও একটি ভাব প্রকাশ করছেন সেই অলঙ্কারযুক্ত। কারণ, তিনি

যে ধাঁচের বা যে ভাবের সাহিত্য লিখেছেন—এখন ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই হউক, পরপারেরই হউক, যে যেদিক্ দিয়ে যা লিখছেন তার ভাবভঙ্গি সে আকার ধারণ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেভাবে চলতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই যে অনিচ্ছার ভাব এটা সত্যচ্যুত। প্রকৃত সত্য হতে বিকৃতরূপ, সে-ই মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা হতে চ্যুত। তার স্বাভাবিক অবস্থা নেই, তার ভাবভঙ্গি কথাবার্ত্তাগুলো সে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। যে কৌতুকপূর্ণ গ্রন্থ লিখছে সে কৌতুক ভাব নিয়েই চলছে, তার ভাবভঙ্গি কথাবার্ত্তাও সেই জাতীয়ই হচ্ছে; যে নাট্যসাহিত্য লিখছে বা নাটক করছে, সেও সেইভাব নিয়েই চলছে। এই ভাবধারাগুলো প্রকৃত তার ভাব নয়, এটা অভাবের সাড়াই আমরা চর্চ্চা করছি। এখানে বেশীর ভাগ শুধু চর্চ্চাই চলছে অভাবের সাড়ার, এটা সাড়ার সাড়া নয়, সাড়ার সাড়া হত সুরমিশ্রিত। আজ সাড়া সুরচ্যুত, কেন হল এজাতীয়? এটা কি আমাদের দুঃখের কথা নয়? বললে চটে যাবে, তাদের দোষ ধরে দিলে তারা রাগবোধ করবে, অপমানবোধ করবে। এই অপমানবোধ, রাগবোধ, দুঃখবোধ,—এটাতো সাহিত্যানুরাগের পরিচয় নয়। যারা প্রকৃত সেবী, প্রকৃত অনুরাগী তাদের ভুল বুঝিয়ে দিলে সংশোধন করার সৎসাহস হবে, এই সৎসাহস সেই সদ্‌বস্তুর সঙ্গেতেই হয়।

সেই সদ্‌বস্তু, সেই নিত্যবস্তু—এই পরিদৃশ্যমান জগতে এই চর্চ্চাতে যিনি মনোনিবেশ করেছেন, এই চর্চ্চার ভেতরে তন্ময়

হয়ে গেছেন, তিনিই নিজের ভুল ত্রুটি শুদ্ধ করার একমাত্র ক্ষমতা অর্জন করেছেন এবং গুণের প্রশংসা তিনিই করে থাকেন। এখানে গুণের প্রশংসা খুব কম। প্রশংসাটা হয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়িক, বিদ্যাকে বিক্রি করা হচ্ছে আর একজনের কৃপার উপরে, দয়া করে একজনে কৃপা করলেই আমার সত্য সত্য হল। ভাল না বললে আমার সত্য আর ভাল হল না, এখন সত্য যদি তোমার কৃপার উপর ভাল বা মন্দ বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তো সাংঘাতিক! তবে সত্য এর জন্য লালায়িত নয়, প্রকৃত সাহিত্য প্রকৃতিই।

তারপর বেশীর ভাগ সাহিত্যিকরা যখন সাহিত্য লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন কোন পথ অবলম্বন করলে কি লেখা যায়, কি বলা যায়, কোন পথ অবলম্বন করলে সুনাম নেওয়া যায়, দুটো অর্থ রোজগার করা যায়—সবগুলো সমন্বয়ে চিন্তা করে এক সাহিত্যের চিন্তা আরম্ভ করলেন। তখনই চিন্তা করলেন সাধারণেরা কোন কোন চিন্তায় বেশী তন্ময় বা পছন্দের অধীনে ন্যস্ত। সাধারণতঃ প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে বেশী নির্ভর করেই তো সাহিত্য চর্চ্চা করছেন। শ্রবণশক্তির ভেতরে নিলেন শ্রবণশক্তি অথবা দর্শনশক্তি ইত্যাদি নানারকম ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে যখন নিতে সুরু করলেন; যিনি লিখেছেন তিনিও বুঝছেন যে এগুলো ঠিক সমাজ অনুযায়ী হলেও বিক্রি হবে না, তখনই উচ্ছ্বাস—সেই উচ্ছ্বাসে কাম সংযুক্ত করে বিরহ ও মিলনে রেখে

প্রেম ও ভালবাসা যুক্ত করে তাতে কামমিশ্রিত করে ঐ চর্চ্চাতে রেখে তিনি সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং গল্পগুলো ঐ প্রসঙ্গক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে যা যা দরকার—যেখানে মিলন, যেখানে বিরহ, যেখানে যেখানে রসদান করা দরকার, এই রসপূর্ণভাব রেখে এটাকে একটা বেশ মধুময় করে একটা মধুর গল্প রচনা করে ফেলল। তবে ইহা কেন এত ভাল লাগে, তার কারণ, জনগণ এ বিষয়ে সচেতন, যিনি লিখছেন তিনিও সচেতন, সচেতনের সঙ্গের সাথে অনুরাগ আছে বলেই এই শাস্ত্রের সেবাতে পারদর্শিতা হিসাবে যে গ্রন্থের রচনা করলেন, অন্যান্য রচনার চেয়ে ইহা একটু বলিষ্ঠা-কারে ধারণ করল; কারণ তার ভাব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলেই গল্পের ভেতর দিয়েও জাগতিক ঘটনাবলী মিশ্রিত। তাই গল্পগুলো জাগরিত বলে মনে হয়—তার জন্যই চর্চ্চাগুলো মুখরোচক বা মধুময় লাগে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, একটু সত্য বা সুন্দর যা আছে তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ বা সংযোগ থাকলেই প্রকৃত ভাব বা সাড়া বের হয়ে পড়ে। একজন শোকার্ত্ত ব্যক্তির যে ক্রন্দন বা যে ভাবপ্রবণতা, আর একজনের নকল শোকের যে ক্রন্দন—দুইয়ের ক্রন্দনে অনেক বৈষম্য। যে প্রকৃত সুরে বা সাড়াতে, তার ধারাতে যে ভাবধারা ন্যস্ত, তার ভাবগুলো সত্য দ্বারাই হবে প্রস্ফুটিত, সেটা সেই চর্চ্চাতে বা সেই সাহিত্যে বা গ্রন্থে হবে জাগরিত। কারণ, জাগরণের সাড়া তাতে ন্যস্ত, তাই

সাহিত্যসম্বন্ধই হচ্ছে—এই জগতের সহিত যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধেই হচ্ছে সৃষ্টি। তাই বিবাহাদির যে সম্বন্ধ, তার সঙ্গমে যে সৃষ্টি, এই প্রকৃতি-পুরুষের মিলনেও সেই স্রষ্টা এবং এই মন ও জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সঙ্গমে সেই একই সৃষ্টি, ঐ সৃষ্টিই হল সাহিত্য; সেই অনুরাগে যে অনুরক্ত বা যে আসক্তিতে আসক্ত—আমাদের এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও যে যতটা আসক্ত সে তত বেশী বৈষয়িক, বিষয়ভোগে যে আসক্ত সে হল বিষয়াসক্ত। এখন বিষয়ের সহিত হতে হবে ঘনিষ্ঠ, সেই বিষয় বলতে যে জগৎ, এই জগতের সহিত যে আসক্ত হবে সে-ই দিতে পারবে রূপ-রস।

এখন বেশীর ভাগ ব্যবসায়ের সহিত সাহিত্য সংযুক্ত হওয়াতে এখন সাহিত্য ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। যেখানেই ব্যবসা সেখানেই বেশীর ভাগ ভেজাল। সেটা তো আর নূতন করে কিছু দেখবার প্রয়োজন নেই, হাটে বাজারে গেলেই সেটা চক্ষে পড়বে। এই ব্যবসাতে ইহাও একজাতীয় ব্যবসা—কেনা বেচার ভেতর যে চর্চ্চার পরিচয় দিচ্ছে, কোথায় কোন বস্তু মিশালে কাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে—খাঁটি বলে ভেজাল চালালে কি ভাবে সুনাম অর্জ্জন করবে; সেখানে ব্যবসার প্রচারের জন্য তার মূল ধনের চেয়ে বেশী প্রচারের জন্য ব্যয় করবে।

এমন রাজত্বের রাজত্ব, ভেজাল বস্তু রেখে লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করে ফেলল, তাই আবার খাঁটি বলে এত প্রচার?

'নিশ্চয়ই ভাল'—বোকাও তো অনেক আছে, তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, অসুস্থতার মুখে পতিত হচ্ছে, দেখছে, শুনছে, বুঝছে, তবুও এত প্রচার? প্রচারটাই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, নিজে যে ভুগছে সেটাও তার কাছে অত বড় নয়, 'নিশ্চয়ই অন্য কিছুর দ্বারা হচ্ছে', তবুও প্রচারের বস্তুকেই সত্য বলে বলতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ সে সে-দিক্ দিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছে। যে যত বেশী অখাঁটিরে খাঁটি বলে ছাড়তে পারবে এবং তার মধ্যে যত বেশী বিশেষণ লাগিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবে, এই ভাবভঙ্গিতে যত বেশী ওস্তাদি ও কাওলাতি দেখাতে পারবে, তার সাহিত্য তত বেশী মধুময় হবে।

এই কাওলাতির ও ওস্তাদির প্যাঁচে পড়ে—অনেক বোকাই আছে মিষ্টি খেতে গিয়ে হাঁড়ির রসেই আটকে পড়ে আছে। এখন এখানে কি হাঁড়ির রসে আটক অবস্থায় রয়েছি কিনা কে জানে, রস তো অনেক রকমই আছে—আঁক-গুড়ের রস, আবার পরিত্যক্ত রস—সেটাও রসই। এখন 'রাবের' ব্যাখ্যায় যে মিষ্টত্বের বর্ণনা, সে বর্ণনায় যারা ডুবেছেন সেই আঠাতেই আটক হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তবে এই আঠা বড় সাংঘাতিক আঠা—'সদা সত্য কথা বলবে, ভাল হয়ে চলবে'—এই গ্রন্থ যতটুকু না ভাল লাগবে—সুনীতি, নীতি, মিনতি, সুরেশ, পরেশ, দীনেশের প্রেম প্রীতিতে আলিঙ্গনে যে গল্প—তা সমস্ত কাজ বর্জ্জন করেও পাঠ করবে। তার কারণ,

সঙ্গম বহু রকমের আছে—পাঠ করে চিন্তা করে এক রসস্বাদ গ্রহণ করেন, সেই রসস্বাদের ভেতরে ভেতরে একজাতীয় স্খলিত হতে থাকে, সেটা তুষানলে দগ্ধ হওয়ার মত কিংবা আমাদের মুদীদোকান বা পানের দোকানের পাশে যেমন দড়ি ঝুলিয়ে অগ্নি রাখা হয়, আর 'নেশাগ্রস্তেরা' ওটার মধ্যে ধরিয়ে ধরিয়ে খেয়ে চলছেন, এর ভেতরেও এরকম একজাতীয় জ্বলতে থাকে—এই জ্বালাটাই হচ্ছে একজাতীয় তন্ময়, তাই এখানকার কাজগুলো তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন এই যে আঠা এও বড় সাংঘাতিক, আর সাহিত্যব্যবসায়ীরা এই সমস্ত আঠার সুযোগ নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। এই আঠাতেই যাতে আটকে না যায়—তারই হচ্ছে ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থাই হল এই জগতের সহিত সঙ্গম আর সত্যানুরাগ, তখনই হবে প্রকৃত সাহিত্য।

দুই

কতকগুলো ভাব বুঝে সাহিত্যিকরা বেশীর ভাগ ব্যবসায়ের দিক্ দিয়েই সাহিত্য রচনা করে থাকেন। সেই ভাবগুলো হল এই—যে ভাব পড়লে বেশ সহজেই মনের ভেতর একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই উত্তেজনামূলক গ্রন্থই রচনা করে থাকেন। সেই গ্রন্থ পড়ে যতটা না শিখবার প্রয়াস বা ইচ্ছা থাকে তার চেয়ে বেশী কামোন্মাদনার সৃষ্টি করে থাকে। এই কামের সুযোগ সুবিধা নিয়ে যে গ্রন্থাদি রচিত হয়, সাহিত্যব্যবসায়ীরা বেশীর ভাগ এই সুযোগ নিয়েই এই গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। তবে এর ভেতরও শিখবার জিনিষ যে না আছে তা নয়। ঐ শিক্ষাতে বেশীর ভাগই বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তার কারণ, ঐ গ্রন্থ পাঠ করে নানাভাবে তা ব্যয় করতে চেষ্টা করে। ঐ ব্যয়ই পরিশেষে অপব্যয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ, উন্মাদনায় উন্মত্ত হলেই এই রোগ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

সর্ব্ব সময়ে একই বস্তুকে সবাই মিলে যদি মূল্য দিতে থাকে, তখন সহজবস্তুও মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। যখনই গ্রন্থকারেরা বা সাহিত্যিকরা যারা গ্রন্থ রচনা করেন বা লিখেন ঐ কামজাতীয় বিষয়ের মধ্যে এবং কামের ভেতরে বা তার ঘটনাবলীর সৃষ্টি করে তার ভেতরে যদি নানা ক্রিয়াকলাপের দ্বারা

রসের উৎপাদন করে, তাতে যে আলিঙ্গন বা প্রেম ভালবাসা, তাতে যে মনের আবেগ সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিতে কাম তন্ময়ে বিভোর থেকে রক্ত চোষার মত দূর হতে চিন্তা করে যে কামের খোরাক ভেতরে ভেতরে গ্রহণ করে, বা এনে যে নিবৃত্তি করে তার পরিশেষে ঐ নিবৃত্তিতে যখন নিবৃত্তি আর না হয়, তখন ঘরে বাইরে নানা চাঞ্চল্যকরের অবস্থা সৃষ্টি করে, নিজেকে চঞ্চল করে তোলে। শেষ অবধি চতুষ্পদ জন্তু পর্য্যন্তও গিয়ে তার চাঞ্চল্যকর বৃত্তির নিবৃত্তি করে। ঘটনাবলীর ভেতরে যখন প্রবেশ করতে থাকে তখন দৃষ্টিভঙ্গিমাগুলোও সেইভাবে নানা দিক্‌দৃষ্টির মাঝে পড়তে থাকে।

যে সহজজাত দৃষ্টি আজ যেটাকে স্বাবলম্বনের দ্বারা ভদ্রতায় আবৃত করে যে নগ্নতাকে পরিধেয় রূপে রেখেছে, ঐ রাখার ভেতরে সেই বৃত্তি থেকেই যাচ্ছে, এই উৎকট বৃত্তির উৎপাদনের কারণ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে গ্রন্থাবলীর বিবরণে যে কাম যে রসাস্বাদ যে গল্প ঘটনাবলীর সৃষ্টি—এই সকলের মূলে সাহিত্যব্যবসাই। সাহিত্যব্যবসায়ীরা, তারা পরিশেষে বা পরিণামে কি হবে তা না ভেবে নিজেদের নির্ব্বাহ বা জীবিকার্জ্জন বা নাম যশ ইত্যাদি চাহিদার জন্যই তারা মনযোগানো বিষয়বস্তুই রচনা করে থাকে। সাধারণতঃ যখন যে লোক যে কোন কাজ করে—সেই কাজের পরবর্ত্তী ফলও যে চিন্তা না করে সে সাহিত্যিক নয়। সুদূর পরিণামের চিন্তা করে যে বর্ত্তমানে কার্য্যকরী কি এবং তার উপকারিতাসম্পর্কে সমূহ ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে সেই

উপকারিতার ক্রমবিকাশের দ্বারা ক্রমোন্নতিতে গিয়ে পরিশেষে উন্নতির পরিসীমায় গিয়ে যে পৌঁছবে, সেই সীমার সীমা টেনে যে কষতে পারবে সে-ই সাহিত্যসেবক হিসাবে গণ্য হবে। তা কয়েকটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আজ মরীচিকার গ্রাসের ভেতরে আমাদের দেশ—এর মূলেই হচ্ছে বৃক্ষাদি উচ্ছেদ। এই উচ্ছেদ যখন আরম্ভ, এই বৃক্ষমূলকে সমূলে যখন বিনাশ সাধ্যে রত হতে আরম্ভ করল, তখনও বোঝেনি যে আমাদের দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। তারা যখন একাজ করেছিল তখন তারা ভালই করছে ভেবেছিল এবং দেশের একটা বিরাট উপকার সাধন হবে এই হিসাবেই তা করেছিল। আজ আমরা কোথায় কোন উন্মাদনার বশবর্ত্তী হয়ে সেই উচ্ছেদের চিন্তা করছি, এরকম বহুরকম সাময়িক উচ্ছেদের ভেতর দিয়ে মনস্থাপন করে বহু মরীচিকার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমূহ কার্য্যকলাপের পদ্ধতির দ্বারা তা অনেককে বিভ্রান্ত করে—বাধার সৃষ্টি করলেও আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে ; তেমনি আজ আণবিক বিস্ফোরণের সম্মুখীন যে পরীক্ষা সম্মুখীন আজ যে মহানন্দের উন্মাদনায় যে অবস্থার সৃষ্টি করছে, পরিশেষে যে মরীচিকার সম্মুখীন হতে হবে—সেই দূরদৃষ্টিসম্পন্নেরই অভাব।

যখন যে করে তখন ভাল মনে করেই করে, কিন্তু সুদূর-দর্শিতার অভাবে পরিণামে এই ফলই ফলে। তারপর নিজেদের প্রাধান্যের জন্য যে যুদ্ধবিগ্রহ এই প্রাধান্যের আসন রাখতে গিয়ে আজ জাতিসমূহ মহাশ্মশানের সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রাধান্য বুদ্ধি

আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির সাধনার্থে যে যশ মান প্রতিষ্ঠার লোভে যে বিদ্রোহ যে যুদ্ধ, তার জন্য যত প্রকার বেআইনীর সম্মুখীন হচ্ছে, শান্তির দিক্ দিয়ে তা মোটেই সমীচীন নয়। এগুলো সকলই একজাতীয় ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা বা চরিতার্থ করবার জন্যই একজাতীয় জাতীয়তার বিরোধিতার সূত্রপাত। যখন করে তখনও জানে না এর পরিণাম কি; এইক্ষেত্রে যদি এইজাতীয় সাহিত্যিকরা এর সেবক হয়ে থাকে বা এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করে থাকে, সেই গ্রন্থ মোটেই গ্রন্থ নয়—এই গ্রন্থের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রয়েছে বিষকণ্টক, ইহা পাঠেও সেই কণ্টকেই আকণ্ঠ কণ্টকিত হয়ে থাকে। তাই এই কণ্টকে যাতে কণ্টকাবৃত না হতে হয় তার জন্যই হচ্ছে মূল গ্রন্থ।

সেই মূল গ্রন্থ কি? সেই মূল গ্রন্থ হচ্ছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই প্রকৃতির সহিত যে গভীর সঙ্গমে রত, তার তত্ত্বকে যে উন্মেষিত করে গভীর তত্ত্বে তন্ময় থেকে সেই বস্তুকে যে উন্মেষ করতে পারবে, গ্রন্থাকারে রচনা করতে পারবে, সেই গ্রন্থকারই হচ্ছে গ্রন্থসেবক। সাহিত্য পাঠ কেন? গ্রন্থ পাঠ কেন? যা পাঠ করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়মনবৃত্তি যদি সহজজাত বা স্বাভাবিক না হয় তবে সে পাঠ পাঠ নয়—এ হল একটী কথা। দ্বিতীয়তঃ পাঠকদের শুধু দুর্নাম দিলে অপবাদ দিলে চলবে না, রচনাকারীরা যে রচনা করছেন, তাদের গ্রন্থের গ্রন্থি যদি পোক্ত না হয় তবে তাদের বাণীও শক্তিশালী হবে না—তা পাঠ করলে সেই শক্তিবিহীনেরই পরিচয় দেবে।

যেই বিষয়বস্তুসম্পর্কে সকলে জানে সেই বিষয়বস্তুসম্পর্কে

উপদেশ দিলে সবাই তা গ্রহণ করবে। বিপদের সময় যখন সঙ্কেতধ্বনি হয়, তখনই বুঝা যায় যে শত্রু সম্মুখীন, সম্মুখীন থাক বা না থাক ঐ সঙ্কেতধ্বনি হলে সকলেই সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। সঙ্কেতের মূল কারণ যদি জানা থাকে তবে সঙ্কেতের জন্য আর সঙ্কেত করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। জীবনবীমা যারা করান তারা লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকার দায়িত্ব নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছেন ; তারা জানেন যে ঐ টাকা তাদের ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যাবার কোন কারণ নেই— তার কারণ, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জীবন সম্বন্ধে সচেতন--ঐ সচেতনের সুযোগ নিয়েই হচ্ছে এই জীবনবীমা। আমাদের এই জীবন আবার বহু বহু বস্তুর উপর নির্ভর করে থাকে, তার কারণ, এই আদানপ্রদানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট বাঁধা বলেই, তাই এখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না বা আসছে না, এটা স্বাভাবিক রীতিনীতিতে চলে আসছে। এত বড় বিশ্বাস যদি সাধারণের নিকট হতেও পেয়ে থাকি নিজেদের জীবন সম্পর্কে, আর বিশ্বাস নেই নিজের মনের ভেতরে, আস্থা হারিয়ে ফেলা হয়েছে নিজের পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়ে। সেই পাণ্ডিত্য কি ? 'আমি খুব বেশী বুঝি' এইভাব পোষণ করে চলছি আবরণ দিয়ে, আবরণের ঢাকনী খুলে যায় কিনা এই সাবধানতাতেই আছি সাবধানে। এই সাবধানতা নিজের আস্থার ভেতরে আস্থা নেই বলেই, যা না তা সাজতে চাই বলেই।

আমি সাহিত্যিক নই, জোর করে সাহিত্য চর্চ্চা করে

সাহিত্যিক সাজব, সমালোচনাকারীর ভেতর নাম লিখিয়ে সু-আখ্যা নেব ; সুতরাং সে যেরকম নিজের ভেতরে নিজেই নড়চড়, কোন অবস্থাতেই তার নেই আস্থা—আবরণ শুধু নকলে আবৃত, তার লেখনীতে কি বের হতে পারে? তিনি যদি গভীর ভাব বা ভক্তিমূলক ভাব বা দেশের সমস্যার সমাধান, উন্নতি, অবনতি, নীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রন্থ লিখতে বসবেন, সেই নীতির সহিত যদি গভীর সঙ্গত না থাকে, তা-হলে কি করে লিখবেন, ঐগুলো যে নীতিবিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। তাই গ্রন্থ লেখবার প্রথম চিন্তাই থাকবে ভেতর ও বাহির একত্রিত করা, এই দুই একত্রিত হয়ে যখন যে অবস্থার বাণী দেবে সেই বাণীতেই হবে গ্রন্থ, কিন্তু দুটো বাণী একইভাবে সংযুক্ত থাকে না, বেশীর ভাগ সংযুক্ত করা বড় কঠিন, তন্ময় হতে হবে, বস্তুর তত্ত্বের তত্ত্বে প্রবেশ না করলে সেই ভেতরের সূক্ষ্মের সহিত এমনি জোর করে সংযুক্ত করা বড় কঠিন। একজনে লিখছেন, 'চরিত্র সংশোধন কর, মনেও কাম চিন্তা করবে না, সর্ব্বদা সেই ভগবৎপ্রেমে তন্ময় থাকবে, তুমি সব সময় মনে করবে তুমি তোমার না, তুমি তাঁর সংসারহিসাবে কার্য্য করছ ; আর এইখানে যা কিছু দেখবে সবই মনে করবে তোমার কিছুই না।' এই নির্লিপ্ত চিন্তা সেই গ্রন্থের ভেতর দিয়ে উপদেশ দান—এদিকে তিনিই যখন লিখছেন বা উপদেশ দিচ্ছেন তিনি যা যা বারণ করলেন সবটাতেই তিনি আছেন। ঐ চঞ্চল মন যেগুলো সে বারণ করতে উপদেশ দিলেন, তার বেলায় কিন্তু তা

নেই, খুঁজে দেখা গেল সমস্ত ইন্দ্রিয় তার সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণে ব্যস্ত—তিনিই যখন রত, তার বাণীতে কে হবে অবনত! তারাই আবার সেই নির্লিপ্ততার যে চেহারা যে আবরণ দিয়ে রাখা দরকার তা দিয়ে রাখে—সেই আবরণে রাখলেই তো নির্লিপ্ত বা ইন্দ্রিয় সেবা হতে পরিত্যক্ত, তা আর বুঝা যায় না। ঐ আবরণে যে আসক্ত তাতে তো আর অনাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ আবরণটি রক্ষা করতে তার যে পরিশ্রম হয়েছে ঐ ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত চেহারা দেখাবার জন্য বা সেই সাধুচেহারা দেখাবার জন্য ঠিক এই জাতীয়ই তার গ্রন্থ রচনা হল আবরণটি হল, নিবারণ আর হল না।

মুখোশে তো প্রকৃত রূপকে আর পরিবর্ত্তন করতে পারল না, তার যে গলদ তা রয়েই গেল, কারণ সে তো জানে সে মুখোশ পরে আছে। সে যতই বড়াই করুক, নিজের ভেতর যে 'আমি নেই', তাতে তো আর সে শান্তি নিজে পাচ্ছে না—সে তো এক অশান্তির মাঝেই বিরাজ করতে লাগল। কেউ বললে না হয় চটে গেল, সে হল মুখোশেরই আর এক জাতীয় অবস্থা, কেহ বেশী চটলে তখন মুখোশেরই আরেকটি মুখোশজাতীয় বাণী আছে, সবাই বলে থাকে, আর বেশী কি বলবে, এটা সদ্‌ব্যক্তিদের জন্যই প্রাপ্য—এই কথাটি না বললে আর মুখোশ স্থায়ী থাকে না। দুর্ব্বলতার এই আর একটি বাণী, উপায় না থাকলে তখন সব কিছুই মানিয়ে নিতে হয় এটা নিরুপায়ের উপায়। আজ বেশীর ভাগ এই উপায়ের দোহাই দিয়ে অনেকেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

এই সমস্ত অপবাদ বা ভুল ভ্রান্তির কারণগুলো জানা থাকা দরকার। কেন হয় অপবাদ, কেন দেয় দুর্নাম, এগুলো হওয়া উচিত ছিল না, কেন হবে তা কি ভেবে দেখা উচিত ছিল না? এই মুখোশ পরিধান করা আর প্রকৃত সত্যকে ঢেকে মিথ্যার দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করাই হচ্ছে মিথ্যা বোধ জন্মিয়ে দেওয়া; বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী সাহিত্যিকদের এক জাতীয় গ্রন্থ রচনা হচ্ছে, তাতে যে বদনাম, অপবাদ বা দুর্নাম হবে তা আর বেশী কি!

মাতাপুত্র যখন রাস্তা দিয়ে যেতে থাকে তখন 'মা'র সঙ্গে কথা বলাতে কে কি ভাবল তা কেউ লক্ষ্য করে না, অবাধে মুক্তভাবে মুক্ত রাস্তায় প্রাণখোলা আলাপ মায়ের সহিত চলতে থাকে। এমন অনেক মাতার চেহারা আছে, তার যে সে উপযুক্ত ছেলে, তাও বুঝা যায় না। কিন্তু ছেলে অবাধে 'মা'র হাত টেনে গলা ধরে আপন মনে চলতে থাকে। উপহাসকারীরা উপহাস করলেও তা আর দেখার সময় থাকে না, তখন উপহাসকারীর মুখ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে; তার কারণ প্রত্যুত্তর না পেলে তা স্বাভাবিক মতে বন্ধ হয়ে যায়। উপহাসকারীরা উপহাস করে—গতিবিধি চালচলনেই তা হয়ে থাকে, কিন্তু মাতাপুত্রের চালচলনে গতি-বিধির কোন বৈষম্য না থাকায় যে স্বাভাবিক স্রোতের বশবর্ত্তী হয়ে উপহাসকারীরা উপহাস করে, তাদের স্রোতের সম্মুখে বাঁধ পড়ে যায়। তার কারণ, স্বাভাবিক চলতিতে স্বাভাবিক চলন আছে বলেই ভ্রাতাভগ্নীর ভেতরে একজাতীয় গতিবিধি আবার ডাক-ভ্রাতাভগ্নীদের ভেতর আরেক জাতীয় গতিবিধি—এখন জোর করে

আপন দেখাতে গিয়ে যে গতিবিধি, প্রতি মুহূর্ত্তে আপন দেখাবার যে চিন্তা—এই চিন্তাতেই গতিবিধির গতি নড়চড় হতে থাকে! ঐ নড়চড়গুলো উপহাসকারীদের উপহাসে পরিণত হয়ে থাকে। সেও জানে না যে তার এরকম হয়ে যাচ্ছে--এগুলোও গ্রন্থ। গ্রন্থ শুধু লেখনীর ভেতর দিয়েই প্রকাশ হয় না, নীরবতার ভেতর দিয়েও প্রকাশ হয়। প্রত্যেক জীবনে প্রত্যেকেই এক-একটি গ্রন্থ। সেই জীবনের চালচলন যদি বিকৃত হয়ে থাকে, তবে গ্রন্থও সেই বিকৃতির সাড়াই দিয়ে যাবে—এই গ্রন্থসমষ্টি হচ্ছে জীবগ্রন্থ।

এখানে অগণিত জীব, অগণিত গ্রন্থ। এই পাঠ দিনরাতই চলছে—যে যা বলছে—এই বলাবলির ভেতর, নিস্তব্ধতার ভেতর, চালচলতির ভেতর, মনে মনে চিন্তার ভেতর, সর্ব্বাবস্থায় গ্রন্থ-কারেরা গ্রন্থ রচনা করে চলছেন। জীবনের চলার পথে যেভাবে চলে যাচ্ছে এবং তা লেখনীতে আবদ্ধ করে যে রচনা করছে; সেই চলার পথের পথেরই সাথী, দুই-ই এক সঙ্গীর সঙ্গী—জীবনও চলছে, অতিবাহিতও হচ্ছে, গ্রন্থলেখনীর ভেতর দিয়েও সেভাবে অতিবাহিত হচ্ছে, তাই জীবনের প্রতিটি গ্রন্থই জীবন। যদি নিজেদের জীবনচরিতসম্পর্কে জেনে নেয় যে তারা কোন রচনার ভেতর চলছে, তারাই যখন লেখনীতে আবদ্ধ করে তাদের সেই মন সেই প্রাণ সেই ভাবভঙ্গি সবই তাদের সেই বিদ্যায়ই তো করল আবদ্ধ। সেখানে ছল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে চলতে হচ্ছে, সত্য বললে প্রতি মুহূর্ত্তে ভীতির ভেতর পড়তে হচ্ছে, কারণ অন্তর্য্যামিত্বহীন দেশ, যারা শুধু বাইরের আচরণ

দেখেই মন্তব্য করেন সেই দেশের বাইরের আচরণের দিক্‌টাই হল প্রধান ও প্রথম। মূল ভেতরে কিছু থাক্ বা না থাক বাইর চালচলনেই হচ্ছে সবকিছু। এই চাল বজায় রাখতে গিয়ে যত প্রকার মিথ্যা, ছল যা কিছু দরকার সবকিছুরই আশ্রয় নিয়ে চলছে। সত্য বললে স্থান নেই, তাই জ্ঞান—অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়ে সেই জ্ঞান বুদ্ধি অজ্ঞানকে করছে প্রস্ফুটিত, বুদ্ধি সেখানেই ক্রিয়াশীল হয়ে ক্রিয়া করে যাচ্ছে। ঐ জ্ঞানকে এক আবরণের দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে, যেমন পর্ব্বত তুষারাবৃত ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নেই, নিদাঘের রাগে ইহা একদিন অপসারিত হবেই, আমাদের ভেতরে সেই প্রখর তেজের দ্বারা সেই অজ্ঞান দূরীভূত হবেই, সেই তুষার দূরীভূত হবেই। কিন্তু এখন আমরা তুষারাবৃতের বা বরফে আচ্ছাদিতের উপরেই পিছলে পিছলে চলে যাচ্ছি—হোঁচট তো খাবই, জমে যাওয়ারও ভয় আছে।

মৃত্তিকা আমাদের থেকে অনেক নীচে—তাই গ্রন্থ রচনাকারীর বিবরণগুলোও সেই আবরণকারীদের মধ্যে অবস্থিত। কুজ্ঝটিকার সম্মুখীন হওয়াতে সূর্য্যকেও সেই অন্ধকারে আচ্ছাদিত লাগছে, কিন্তু সে আচ্ছাদিত নয়—সে অতি দূরে আবার অতি নিকটে। আমাদের সেই সত্য জ্ঞান আমাদের ভেতরে নিদাঘের মত উদ্ভাসিত—এই আচ্ছাদিতকে অপসারিত করে আমাদের জ্ঞান যদি সেই উদীয়মানের রশ্মিতে আবৃত থাকতে পারতো, তবে আমাদের রচনাতে কোন বিভ্রান্তি ঘটতো না। গ্রন্থরচনা সেই ভাস্করের প্রখর তেজপূর্ণের মতই হতো, সত্য

ও জ্ঞান জ্ঞানানলের দ্বারাই সবকিছু হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, আমরা সেই বৈদগ্ধেই দগ্ধ হয়ে সেই গ্রন্থ রচনা করতে চাই, আমরা সেই সঙ্গতেই সঙ্গম করতে চাই। আজ আমাদের বহ্নি কোথায়?—বহ্নি সেই জঠরে। এখন এই জঠরের উপরে সেই বহ্নির তাপের যে রেশ আসছে, সে রেশে নিজের শরীরের তাপের সহিত বন্ধুত্ব করে একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তাই রেশের রেশ আছে বলে বুঝা যাচ্ছে না, একেবারে যে না আছে তাও নয়।

এখন যারা গ্রন্থ বেশীর ভাগ রচনা করছেন বা যাদের মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়গুলোর মুখোশ পরিধানে আছে তাদের ভেতরে যে রেশ খেলছে অর্থাৎ নিজের তাপের সহিত একই তাপে রয়েছে, ইন্দ্রিয়ের রেশগুলোও মুখোশের রেশের সহিত একত্র হয়ে রচনার রেশের সহিত একই সূত্রাকারে গ্রন্থ রচিত হচ্ছে; সুতরাং এ গ্রন্থে মনের সমস্যার মত সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। যে পাঠ করবে একই তাপের মাত্রায় থেকে যায় বলেই চুপ করে যাচ্ছে, তাতে ইন্দ্রিয় সেবার ভোগ্য বস্তু কিছু পায় বলেই ঐ আহারেই নিবিষ্ট থেকে আঠার মত লেগে থাকছে, এই আঠাকেই দূরীভূত করতে হবে। সেই সত্য ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত হবে না—সেই জ্ঞান ও সত্য সকল জীবগ্রন্থের ভেতরেই প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিদিন অজস্র অজস্র জীবগ্রন্থের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, চরিত্রের বর্ণনাও প্রতিদিনই একটু নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিপাত করলেই পাঠ করা যাচ্ছে, নামকরা ব্যক্তিদের জীবন পাঠ করা তো

আছেই। নামী ছাড়া কে আছে? যার যার জীবনে সেই নামী, বহু ঘটনার সম্মুখীন প্রত্যেকেই যখন হচ্ছে, সেই কীটাণুকীট হতে সুরু করে সকলে একই অবস্থায় আছে। এখন আমাদের পাঠ করতে হবে জীবগ্রন্থের জীবনচরিত—সেই জীব কোথায়? এই প্রকৃতিগ্রন্থটি প্রথম পাঠ করতে হবে, এই সঙ্গতেই মনোনিবেশ করলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা এই জীবগ্রন্থের জীব পরিষ্কারেই রয়েছি, অপরিষ্কার তাড়াতাড়ি নাম ফাটবার জন্য সাজিয়ে মুখোশ পরিয়ে বেড়াচ্ছে, তার জন্যই সুন্দর অঙ্গ বিকলাঙ্গে পরিণত হচ্ছে। সেই সুন্দর জীবনচরিত বিকৃত হয়ে নামের নাম ফাটাবার উদ্দেশ্যে জীবিকা-র্জ্জনার্থে নানারকম সমস্যার প্যাঁচে পড়ে রূপকে বিকৃত রূপ, অঙ্গকে বিকলাঙ্গ, স্থিরকে অস্থির, অস্থিরকে স্থির, শয়তানকে সাধু, সাধুকে শয়তান করছে আর লেখক নিজেও সাহিত্যিক হিসাবে সাহিত্যসেবায় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিলেন এই গ্রন্থ রচনার ভেতর দিয়ে।

এখন কে বেশী কে কার অনুরাগের পরিচয় দিবেন তাই হচ্ছে কথা। এই যে অনুরাগ ইহারও একজাতীয় পোষাক আছে, সেই পোষাকটি পরিধান করে বেশীর ভাগই অনুরাগীর চরম হয়ে যে রাগের টান দিলেন, গ্রন্থ সেই রাগ হতেই রচনা হল। কিন্তু তাতে 'কিন্তু'ই রয়ে গেল—সমস্যার আর সমাধান হল না; তারা সমস্যাগ্রন্থ রচনা করলেন অনুরাগের মুখোশ পরিধান ক'রে। সত্য ও জ্ঞান কোন রাগরাগিনীর টানের

উপর নির্ভর করে না; সে তার নিজের টানেই নিজে বিভোর। সূর্য্যের আলোর নিকট কোন আলোরই আলো থাকে না, অনুরাগের সেই বিদ্যুৎ—জ্ঞানবিদ্যুতের নিকট নগণ্য। সুতরাং এই অনুরাগের বশবর্ত্তী হয়ে যে রাগ-অনুরাগ, ঐ রাগের নিকট রাগবিহীন, এই রাগ মান অভিমান নয়, সুরের টানের টান, সুরের রাগরাগিনীর টান, তাই সুরের সহিত সুর না মিলালে সুর বের হবে না। এখন চলছে বিলাপের সুর, আলাপ নেই, আলাপ যখন আসবে, তখন সুরের ধ্বনিতে গভীর তন্ময় থাকলে সে ধ্বনি ধ্বনিত হবে, সুর তখন আপনিই বের হবে। আলাপ যখন নিস্তব্ধ হয়ে সে তার তান সাধবে —সাহিত্যসেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্যসঙ্গ সবকিছু তখনই প্রকৃতির প্রকৃত গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়ে গ্রন্থাকারে বের হবে, সেই গ্রন্থই এই জীবগ্রন্থ, জীবই সব, জীবই সাহিত্যিক—সব জীবই সব।

আমাদের সেই চর্চ্চাই করা উচিত, যেই চর্চ্চা করলে প্রকৃত চর্চ্চার বিকাশ হবে, বাইরে কোন দিকে তাকিয়ে গ্রন্থ লিখলে গ্রন্থে গ্রন্থসমস্যা থেকেই যাবে। তাকাতে হবে সেই নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে, যেই বস্তুতে মনস্থাপন করলে আপনিই সেই তত্ত্ব বের হবে, তাতে গ্রন্থের ছন্দে ছন্দে মিলতি থাক বা না থাক তার অপেক্ষা করবে না। ছন্দ মিলাতে গেলে গন্ধের সর্ব্বনাশ হবে, আর ঘটনাগুলো সেই বস্তু হতেই বহির্গত হবে। মন যোগাবার জন্য কোন কিছু রচনা করবে না—সেই রচনাই

হবে দোষদুষ্ট, সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের সাহায্যকারী, তার বিনাশ করতে হবে অগ্রে। ভাল বলুক এই ভেবে গ্রন্থ লিখলে গ্রন্থ ভাল হবে না, পণ্ডিত সাজবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখলে পণ্ডিত সাজা যাবে না, কল্পনার উপরে ভিত্তি করে গ্রন্থ লিখলে গ্রন্থ হবে না, হবে মুখোশবৎ। সেই মুখোশকে অপসারিত করে যে যেই ঘটনার মধ্যে রয়েছে সে সেই ঘটনাবলীই যদি লিখে যায়, তাতে ভাল বলুক বা না বলুক, অপবাদ দে'ক বা না দে'ক, কেউ ডাকুক বা না ডাকুক—যে সকলের ভয়ে মুখোশ পরছে তা যেন না করে। এই সত্যতেই যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং যে লিখতে কোন প্রকার দ্বিধা করবে না, তার গ্রন্থই গ্রন্থ হবে। কিন্তু তা হলে কত জন গ্রন্থকার যে মিলবে তাতে সন্দেহ আছে।

জীবনের সব সত্য বলতে গেলে কত জন গ্রন্থকার, সাহিত্যিক টিকবেন সে বিষয়ে একটু ভাবা উচিত। প্রত্যেকেই আবার সত্য কথা বলে আসছেন কিনা, না এভাবই প্রচার করে চলছেন; কিন্তু সত্য যে বস্তু তা পাঠ করলেই বুঝা যায় তিনি কোন স্তরে আছেন। 'Morning shows the day'—প্রত্যূষের ভাব দেখেই সারাদিনের ভাব বুঝে নেওয়া যায়—গ্রন্থকারকে চেনার কোন প্রয়োজন নেই, গ্রন্থ হচ্ছে তার পরিচয়, তাতেই যা মিলে যায়, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐ লেখনীতে মনোনিবেশ করলে সেই গ্রন্থকারের চরিত্র বিবরণ আপনিই প্রকাশ হয়ে যাবে, এও একদিন আসবে, এই লেখনীর ধাঁচের দ্বারা সব জীবনের

ঘটনাবলী বের হয়ে যাবে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তি এই সঙ্গতের দ্বারাই বের হয়ে যাবে, কেহ আবার জীবনের সহজ কথা বলেও যেমন সত্য বলল ব'লে বলে দু'একটি ঘটনা কেহ বলতে পারে না, কেহ সঙ্কোচ করে বলে ফেলল, বলতে সঙ্কোচ বোধ করে, তাতেও তার সত্য প্রকাশ হল না। সেখানে দেখতে হবে মিলতিতে গিয়ে তিনি কি করেছেন, দেখা গেল এই প্রতিটির শেষ আর পাওয়া যায় না; কারণ, যাঁরা বেশীর ভাগ লিখছেন, সাধু সাজবার প্রয়াসেই লিখছেন কিনা; সাধু বলুক, সৎ বলুক, সত্যভাষী বলুক এই চিন্তাতে আছে—এই চিন্তাতে আছে বলেই ঘটনাগুলোও ঐ মুখী হতে থাকে, তবে যাই হোক লিখতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হয়। কাউকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্লেষণ করা, তাতে আমি, আমরা সবাই জড়িত। এখানে বলা হচ্ছে শুধু এই যে; জ্ঞানে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে শত বাধা বিঘ্ন বিপদের সম্মুখীন হলেও সেই জ্ঞানচ্যুত হওয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও উচিত নয়, সেটা বাইরেও নয়, ভেতরেও নয় তবেই হবে, সেই হবে প্রকৃতির প্রকৃত গ্রন্থ, এই গ্রন্থ পাঠ করলে কাউকে বলে দিতে হবে না যে তুমি এই কর আর সেই কর—আপনিই সেই সঙ্কেতের মত সাবধান হয়ে যাবে। আর একদিন এ বিষয় আরো বিশ্লেষণ করে আলাপ হবে, এখন কিছুটা মাত্র জানিয়ে দেওয়া হল—মোটামুটি এখন এই থাক্।

PRESENTED

LIBRARY
No.....
Sri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে অন্যান্য পুস্তক—

১। শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর দর্শনসার
—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পি-এচ ডি।

২। শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারী উপদিষ্ট তত্ত্বালোক—
শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ন্যায়-তর্কতীর্থ।

৩। শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর শৈশবকাহিনী

৪। TATTAVALOKA.
(Light of Truth).
—Commentary by Sri Ananta Kumar Bhattacharya, Nyaya Tarkatirtha.

PRESENTED

LIBRARY
No.....
BANARAS